শেষ পাতা | শুক্রবার ॥ গাইবান্ধা, ১৪ এপ্রিল-২০২৩, ১ বৈশাখ ১৪৩০, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৮৬, মূল্য ৩ টাকা

দৈনিক মাধুকর

SKS

‘বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি’

এসকেএস ফাউণ্ডেশন

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ১লা বৈশাখ ১৪৩০

নববর্ষের শুভেচ্ছা

আজ পহেলা বৈশাখ ১৪৩০। বাঙালির একমাত্র সর্বজনীন উৎসব। এ উৎসবকে ঘিরে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র জাতি তথা আপামোর জনগণ জেগে ওঠে নবপ্রাণে নব-অঙ্গীকারে। পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব। নতুন বছরের এ উৎসবের সঙ্গে বাঙালির গ্রামীণ জীবনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে জড়িত। পহেলা বৈশাখ বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে বাঙালির আত্মপরিচয় ও শেকড়ের সন্ধান মেলে। স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই উৎসব গ্রামীণ জীবনের সাথে সাথে নাগরিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কালক্রমে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আর কেবল আনন্দ-উল্লাসের উৎসব নয়, বরং বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাঙালি জাতি হিসেবে বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আমরা কেউ অগ্রাহ্য করতে পারি না। পহেলা বৈশাখে নব উদ্যমে অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত সবকিছু বরণ করে নেয় সমগ্র জাতি। অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলে গিয়ে নতুনের পথ চলা, নতুন করে শুরু করা, হতাশাকে ভুলে গিয়ে এক সুন্দর ভ্রাতৃত্বময় সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখা। বৈশাখী মেলা মানেই এক অসাম্প্রদায়িক মিলন মেলা। মেলায় রবীন্দ্র, নজরুল, লালন, হাছন রাজা, জারি-সারিসহ বাঙালির প্রাণের বিভিন্ন গান বেজে ওঠে। গ্রামীন আড়ং আর শহুরে মেলার বিভিন্ন স্টলে ধুম পড়ে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবারের। বড় বড় শহরে নামে বিভিন্ন শোভাযাত্রার ঢল।

এসকেএস ফাউণ্ডেশন তার জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালি সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে, সাথে সাথে এর বিকাশ ও প্রসারে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যদিয়ে এসকেএস ফাউণ্ডেশন বাঙালির এই প্রাণের উৎসবে শামিল হয় এবং সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎসবকে সর্বজনীন করে তোলে। পহেলা বৈশাখ প্রেরণা ও সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। বিগত বছরের গ্লানি, দুঃসহ-স্মৃতি, দুঃখ-বেদনা, হতাশা, অসুন্দর ও অশুভকে পেছনে ফেলে নতুন প্রত্যয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করা হোক নববর্ষে আমাদের এবারের অঙ্গীকার। আমি আজ ১৪৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে সকলের মঙ্গল কামনা করি। শুভ নববর্ষ!

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউণ্ডেশন

মিহির সরকার, সহকারী শিক্ষক - চারু ও কারুকলা, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

বাংলা বর্ষবরণ: বাঙালির ঐতিহ্যিক চেতনার উৎসব

অধ্যাপক মাজহারউল মান্নান

বাঙালির বার মাসে তের পার্বণ। প্রত্যেকটি পার্বণের পেছনে মূল উদ্দেশ্য আনন্দ-উৎসব। এসব উৎসবের অধিকাংশই আবার কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের কিংবা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন মুসলমানের ঈদ, হিন্দুর পূজা, খ্রিস্টানদের বড়দিন, বৌদ্ধদের প্রবারণা ইত্যাদি। শুধু একটি ক্ষেত্রে বাঙালি, পৃথিবীর যে যেখানে আছে সবাই, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই একটি উৎসব একসাথে পালন করে, তা হচ্ছে পয়লা বৈশাখ তথা বাংলা বর্ষবরণ। এমন অসাম্প্রদায়িক চেতনার সার্বজনীন উৎসব পৃথিবীতে সংখ্যায় খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এখন তো প্রায় একঘরে হতে চলেছে। এখনকার রাষ্ট্র-সমাজ মাল্টি রিলিজিয়াস। বহু ধর্মের, বহু বর্ণের। এখন আর সকলকে একই বিশ্বাসে বাঁধা সম্ভব নয়। কারণ বিশ্বাস ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায় বিশেষের আর উৎসব সার্বজনীন। সেদিক থেকে বাংলা বর্ষবরণ একটি সর্বজনগ্রাহ্য উৎসব। আর এ কারণেই এই উৎসব বাঙালির জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ।

উপমহাদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে এই জনপদে বসবাস ছিল এক কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর। অস্ট্রিক ভাষাভাষী এই জনগোষ্ঠী কৃষির সাথে সাথে কুটির শিল্পেও এক আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় রেখেছিল। বলা বাহুল্য ‘কৃষিজীবী, মৎস্যাহারী, ফলমূলে আসক্ত এই জনগোষ্ঠীই এই ভূমিতে কৃষি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে। হয়তো উর্বরভূমি ও পানিতে বিপুল রূপোলী মৎস্য সম্পদ এবং গাছগাছালিতে আকীর্ণ পরিবেশ এদেরকে এই আচরণে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। ‘উপমহাদেশের এই অঞ্চলে নববর্ষের উৎসব উদযাপনের শেকড় অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এর মূলেও আছে এই ভূমিভিত্তিক পেশা- কৃষি। গোড়ায় নববর্ষ ছিল ‘আর্তব উৎসব’ বা ঋতুধর্মী উৎসব। ঋতুধর্মী বলে কৃষির সাথে এর সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ট। তবে বাংলা নববর্ষ পালনের ইতিহাস খুব পুরোনো নয়।

অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা এ বিষয়ে এক মত যে, মোগল সম্রাট আকবর বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র ও ফসল ওঠার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে খাজনা আদায় সংক্রান্ত কাজকর্মের সুবিধার জন্যেই বাংলা সন চালু করেন। এ কারণে বাংলা বছর গোনার হিসেব ‘ফসলি সন’ নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য বাঙালি জাতি আরও পূর্ব থেকে বর্ষবরণ শুরু করেছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। তখন বৈশাখ নয়, বর্ষ শুরু হতো অগ্রহায়ণ থেকে। ‘অগ্র’ এবং ‘হায়ণ’ এ শব্দ দু’টির অর্থানুযায়ী এই অভিমত অনেকাংশে সত্য বলে অনুমিত হয়। কারণ কৃষকের তখনকার শ্রেষ্ঠ শস্য ‘আমন ধান’ ওঠার মৌসুম ছিলো অগ্রহায়ণ থেকে। যেহেতু এদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল ধান, সেই সেরা শস্য ‘ধান’ ঘরে ওঠার মাস থেকেই বর্ষ গণনার প্রচলন শুরু হয় বলেই উপর্যুক্ত অভিমত সমর্থন করেন অনেকে। নতুন ফসল ঘরে ওঠার আনন্দে তাই কৃষিজীবী-সমাজ অগ্রহায়ণে উদযাপন করে নবান্নের উৎসব।

যাহোক, আমাদের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ যে বাংলা সন তারিখ অনুসরণে অভ্যস্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা নববর্ষ তাদের কাছে এক উৎসবের দিন। ইংরেজি বছর কখন এলো, কখন গেলো সেদিকে তাদের তেমন একটা ভ্রূক্ষেপ নেই। কৃষিভিত্তিক এই দেশে বাংলা মাস হিসেব করেই ফসল বোনা ও ফসল কাটা হয়। দেশের শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বাংলা দিন তারিখ একান্তভাবে সম্পৃক্ত।

নববর্ষ উদযাপনের আসল প্রেরণা মনস্তাত্ত্বিক। ধারণাটি হলো এ রকম, আজকের দিন যদি ভালো যায়, তবে সারাটি বছরই হয়তো ভালো যাবে, মাঠও ভালো ফসল উপহার দেবে। কাজেই আজকের এই দিনে ভালো খাদ্য-খাবার, লাঙলের বাহন গো-জাতির পরিচর্যা, কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান-আনন্দের ব্যবস্থা হোক। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পয়লা বৈশাখে কেউ ধার-হাওলাত দেয় না কিংবা নেয় না। এমন কি অতি সামান্য জিনিস ও ঘরের বাইর করতে চায়না গ্রামের মানুষ। চৈত্রের নিদারুণ দাবদাহের মধ্য দিয়ে বর্ষ শেষ হয়। বৈশাখের শুরুতে একটি শুভ নববর্ষের জন্য মানুষ প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করে প্রচণ্ড খরার অবসানের জন্য। কামনা করে এক পশলা বৃষ্টি। কারণ কৃষিপ্রধান বাংলার ফসলের জন্য বৃষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম। ‘বৃষ্টি হলেই জমিতে লাঙল যায়, ধানের সবুজে চলে বাতাসের মাতামাতি, গাভিন ক্ষেতের গর্ভে সৃষ্টি হয় শীষের আলোড়ন, বৃষ্টিভেজা মাটিতে মৌসুমী সবজির বীজ পুতে দেয় চাষীবউ। ‘কৃষিতে আধুনিকায়নের ফলে এসবে ব্যাপক পরিবর্তন এলেও এই নিয়ম একেবারে হারিয়ে যায়নি আজো।

জমিদারি আমলে নববর্ষ উপলক্ষে পয়লা বৈশাখে জমির খাজনা আদায়ের জন্য যে পুন্যাহ্‌ অনুষ্ঠিত হতো তা কৃষকপ্রজার জন্য কোনক্রমেই সুখকর ছিল না। তবুও ঐ একটা দিন জমিদাররা দরিদ্র প্রজাদের উপর অত্যাচার করতো না, আংশিক খাজনা পেলেই সন্তুষ্ট থাকতো। সকলকে মিষ্টিমুখ করাতো। সকলের চিত্তবিনোদনের জন্য দিন শেষে আয়োজন করতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের।

নববর্ষের সাথে সম্পৃক্ত আর একটি অনুষ্ঠান ‘হালখাতা’। গ্রামবাংলায় হালখাতার তাৎপর্য শহরের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত বাংলা বছরকেন্দ্রিক। ব্যবসায়ীরা চৈত্র মাস শেষে সমস্ত হিসেব নিকেশ শেষ করে পাওনাদারের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে দেনাদারের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের জন্য করে হালখাতা। ব্যবসায়িক কঠোরতা সত্ত্বেও ঐদিন মহাজনকে আংশিক পাওনা পরিশোধ করে মিষ্টিমুখ হয়ে ঘরে ফিরতো কৃষককুল।

বর্ষবরণ উপলক্ষে গ্রামের হাটতলা, রথতলা, বটতলা অথবা নদীসঙ্গমস্থলে বসতো বৈশাখী মেলা। কোথাও একদিন, কোথাও সাতদিন, কোথাও মাসকালব্যাপী চলতো সে মেলা। উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত বাঙালি কৃষকের নিরানন্দ জীবনে খানিকটা চিত্তবিনোদন ও সামাজিক মেলামেশার আয়োজন; দ্বিতীয়ত কৃষিনির্ভর সমাজের পেশাভিত্তিক পণ্য বিপণন। জাতি-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে সাংসারিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটাতে সকলকে আবাহন করতো বৈশাখী মেলা। বস্তুত গ্রামীণ উৎপাদনের প্রচারমাধ্যম হিসেবে এই মেলার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ষাটের দশকের শুরুর দিকে বটতলা-রথতলার সেই স্নেহাঞ্চল ছেড়ে মেলা উঠে আসতে থাকে নগরের কেন্দ্রস্থলে। মেলার আয়োজন করে শহরের শিক্ষিত সচেতন মানুষ। সুদৃশ্য তোরণ সাজিয়ে, ব্যয়বহুল মঞ্চ বেঁধে রবীন্দ্র সংগীত আর সেতারের সুরের মুর্চ্ছনায় বরণ করে পয়লা বৈশাখ, উদ্বোধন করে বৈশাখী মেলা। বর্ষবরণোৎসব ও বৈশাখী মেলায় সন্তানের হাত ধরে এসে মানুষ একদিনের জন্য হলেও মনেপ্রাণে বাঙালি সাজে। আত্মপরিচয়ে গর্বিত হয়, স্পর্ধিত হয়। হৃদয়ে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটির অনুসন্ধান করে।

পাকিস্তান সৃষ্টির গোড়াতেই বাঙালির এই শেকড়সন্ধানের বিষয়টা শঙ্কিত করে তোলে পশ্চিমা শাসকদের। তারা সে সময় বাঙালিদের এক প্রকার মুসলিম বাঙালি বানানোর অপচেষ্টা চালায়। তাদের এই ষড়যন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য হয় বাংলা ভাষা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে পথে নামা নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপরে নির্বিচারে চালায় গুলি।

এর ঠিক বছর দুয়েকের মাথায় ১৯৫৪ সালে বাতিল করে নববর্ষের ছুটি। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খানের নির্দেশে তার ক্ষমতাধর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন রবীন্দ্রনাথ। শোনা যায় এসময় পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খাঁ না কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে রবীন্দ্র সঙ্গীত লিখতে পর্যন্ত বলেছিলেন। সত্যমিথ্যা জানি না তবে রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ ঘোষণার অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি ফুঁসে ওঠে। প্রতিবাদে ১৯৬৭ সালের পয়লা বৈশাখ সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট রমনার বটমূলে করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশাল আয়োজন। সাড়ম্বরে উদযাপন করে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। বাঙালি শক্তি ও সাহস সন্ধান করতে থাকে তার নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঠিকানার মধ্যে। বাংলা ভাষা, বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ এবং পদ্মা-মেঘনা-যমুনার ঠিকানা হয়ে ওঠে বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধিকার আন্দোলনের প্রাণশক্তি। একদিন এই রক্তাক্ত পথ বেয়েই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জাতি অর্জন করে মহান স্বাধীনতা।

রক্তমূল্যে কেনা স্বাধীন দেশে আবারও বাঙালি সংস্কৃতির উপর আসে আঘাত। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ও মৌলবাদী গোষ্ঠী পাকিস্তান আমলের মতোই বাঙালি সংস্কৃতিকে অনৈস্লামিক আখ্যা দিয়ে এসবের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে। তারা জাতীয় সঙ্গীত ও শহীদ মিনার নিয়েও প্রশ্ন তোলে। এমনকি শহীদ মিনার, স্মৃতিস্তম্ভ, ভাস্কর্য ভাঙ্গারও ধৃষ্টতা দেখায়। এরাই দু’হাজার এক সালে রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করে নিরীহ মানুষের রক্তে ভাসিয়ে দেয় অনুষ্ঠানস্থল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সকল প্রকার ভয়কে জয় করে আবার নতুন উদ্যমে ঘুরে দাঁড়ায় শান্তিকামী মানুষ। পরের বছর রমনার বটমূলে দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে দেয়, বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণশক্তি অবিনাশী, এর বিনাশ সম্ভব নয়। মানব-দানবের এ যুদ্ধে মানবের জয় অবশ্যম্ভাবী।

দেশ আজ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। হাজারো সংস্কারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসছে মেয়েরা। ক্রমেই কেটে যচ্ছে অন্ধকার। সেদিন বেশি দেরি নেই যেদিন নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে একটি সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেখানে থাকবে না দারিদ্র, থাকবে না সমপ্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানি, থাকবে না মৌলবাদের করাল থাবা। মানুষ অবাধে, নিঃশঙ্ক চিত্তে পালন করবে তাদের প্রাণের উৎসব। সফল হবে জাতির জনকের সোনার বাংলার স্বপ্ন।

বাংলা নববর্ষ বরণের এই শুভক্ষণে এ হোক আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা। নববর্ষ সকলের জীবনে বয়ে আনুক শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। শুভ নববর্ষ।

– শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও ফোকলোর গবেষক।

বছরক্রান্তিতে হালখাতা

ড. অনামিকা সাহা

“বছর শেষে ঝরা পাতা বলল উড়ে এসে, একটি বছর পেরিয়ে গেল হাওয়ার সাথে ভেসে।” বাঙালি সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত এক সর্বজনীন প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে অতীতের কথা ভুলে আমরা নতুনের আহ্বানে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। নববর্ষ আমাদের জীবনে নিয়ে আসে নতুন স্বপ্ন, বেঁচে থাকার নবীন আশ্বাস। প্রাত্যহিক কাজকর্মের পরিবর্তে এই দিনে বাঙালির ঘরে ঘরে চলে উৎসবের আমেজ। ঘরবাড়ি পরিষ্কার হয়, সবাই পরিধান করে নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ, আয়োজন চলে পান্তা-ইলিশের, সবাই দল বেঁধে যায় বৈশাখী মেলায়। বস্তুত, নববর্ষ মিশে আছে বাঙালির সত্তার সঙ্গে, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে। সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের দর্পণ। এটা নিরন্তর চর্চার বিষয়। আমরা যা ভাবী, পছন্দ করি এবং যা প্রতিদিনের জীবনাচরণে প্রতিফলিত হয় তা-ই আমাদের সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানে নিজস্বতা নিয়ে সুন্দরভাবে বিচিত্রভাবে বেঁচে থাকা।

বাঙালির আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। সাংস্কৃতিক পরিচয়, জাতিসত্তার ঠিকানা এবং প্রতিবাদের শক্তি-উৎস হিসেবে নববর্ষের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব। বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে নববর্ষের রয়েছে একটি নিবিড় সংযোগ। দূর-অতীতে নববর্ষের প্রথম দিন থেকেই বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনের বার্ষিক নতুন পথচলা শুরু হতো, এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে এই ঐতিহ্য। ব্যবসায়ীদের কাছে এ অনুষ্ঠান ‘হালখাতা’ নামে পরিচিত। হালখাতা হল পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে পালিত একটি উৎসব যাতে গত বছরের সমস্ত হিসাব-নিকাশ শেষ হয় এবং একটি নতুন খাতা খোলা হয়। এটি বাঙালি দোকানদার এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা পালন করা হয়। হালখাতা হলো বছরের প্রথম দিনে দোকানপাটের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া। বছরের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীরা তাদের দেনা-পাওনার হিসাব সমন্বয় করে এদিন হিসাবের নতুন খাতা খোলেন। এজন্য ক্রেতাদের বিনীতভাবে পাওনা শোধ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়; শুভ হালখাতা কার্ড-এর মাধ্যমে ঐ বিশেষ দিনে দোকানে আসার নিমন্ত্রণ জানানো হয়। এই উপলক্ষে নববর্ষের দিন ব্যবসায়ীরা তাদের ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করান। ক্রেতারাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পুরনো দেনা শোধ করে দেন। আগেকার দিনে ব্যবসায়ীরা একটি মাত্র মোটা খাতায় তাদের যাবতীয় হিসাব লিখে রাখতেন। এই খাতাটি বৈশাখের প্রথম দিনে নতুন করে হালনাগাদ করা হতো। হিসাবের খাতা হাল নাগাদ করা থেকে ‘হালখাতা’-র উদ্ভব। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোট-বড় মাঝারি যেকোনো দোকানেই এটি পালন করা হয়ে থাকে। হালখাতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি হয়।

বছরক্রান্তিতে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবে এই হালখাতা অনুষ্ঠানটির সাথে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ হয় আমার ছেলেবেলায়। বাবা পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। পহেলা বৈশাখের সকালে নতুন বস্ত্র পরিধান করে সিদ্ধিদাতা গণেশ ও বিত্তের দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হতো এই কামনায় যে, সারা বছর যেন ব্যবসা ভাল যায়। দেবতার পূজার্চনার পর তার পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুরে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত ও পয়সা দিয়ে শ্বেত ও রক্ত চন্দন এবং কাঁচা হলুদ চর্চিত খাতায় নতুন বছরের হিসেব-নিকেশ আরম্ভ করা হতো। হালনাগাদের খাতাটি ছিল লাল রঙের সালু কাপড়ের মলাটে মোড়ানো। দুই-তিন ভাঁজ করে তার উপর ফিতা দিয়ে বেঁধে রেখে হাত বিনিময় হতো। এই খাতাটিই ছিলো সারা বছরের যাবতীয় হিসাব বিবরণীর নথি। এই দিন ক্রেতাদের আনন্দদানের জন্য মিষ্টান্ন, নাড়ু, সন্দেশ, ঠান্ডা পানীয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হতো। আমাদের গ্রামে অনেক ব্যবসায়ী অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেও হালখাতা বা শুভ মহরত অনুষ্ঠান করতেন।

নববর্ষের প্রথম দিনে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে কৃষিকাজের সূচনা হয়। হয়তো মাঠ চাষের অনুপযোগী, বৃষ্টির জন্য কৃষক আকাশের দিকে তাকিয়ে, তবু নববর্ষ এলে শুভ-সূচনার উৎস হিসেবে তিনি মাঠে যান, সামান্য চাষ করে নতুন বছরের কৃষিকাজ শুরু করে দেন। এভাবে বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গেও নববর্ষের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। নববর্ষের সঙ্গে অন্য যে প্রসঙ্গটি নিবিড়ভাবে জড়িত, তা হলো বৈশাখী মেলা। নববর্ষে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে মেলা। বৈশাখ মাসজুড়ে চলে এই মেলা। কোথাও বা তিনদিন বা সাতদিনের মেলাও বসে। এসব মেলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি হয়, বিক্রি হয় নানা ধরনের খেলনা। এসব মেলায় যাত্রা, পুতুল নাচ ও সার্কাস বসে, গ্রামীণ জীবনে দেখা দেয় নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা। অতীতে, বাংলার সামন্তযুগে, নববর্ষের সঙ্গে ‘পুণ্যাহ’ অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। এই অনুষ্ঠানে প্রজা সাধারণ জমিদারকে খাজনা পরিশোধ এবং নতুন বছরের খাজনা প্রদানের সূত্রপাত করত। জমিদারতন্ত্রের অবসানের ফলে এ প্রথা এখন উঠে গেছে।

জাবির, শ্রেণি: নার্সারি, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

“তুমি, নির্মল করো, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ॥
তব, পূণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।”

রজনীকান্ত সেন- এর এই আকাংক্ষার সাথে সুর মিলিয়ে বলি, নববর্ষের পূণ্য কিরণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জীবন নির্মল হোক। শুভ নববর্ষ।

– উপাধ্যক্ষ
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা।

রুদ্র প্রতাপ রায়, ৫ম শ্রেণি, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

বৈশাখ ও বাঙালির সংস্কৃতি

মোদাচ্ছেরুজ্জামান মিলু

আমরা বাঙালি। আমরা উৎসবমুখর জাতি। যে কোনো উৎসবে মাতিয়ে উঠি, মাতিয়ে তুলি। সকল উৎসবের মধ্যে পহেলা বৈশাখ আমাদের প্রাণের উৎসব। কারণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ভুলে সকলে মেতে উঠি এই পহেলা বৈশাখের উৎসবে। পোশাকে, খাওয়াতে, সংগীতে, অনুষ্ঠানে, নৃত্যে মেতে উঠি এক বর্ণিল আনন্দে। পহেলা বৈশাখে আমরা পোশাক বানাই। পহেলা বৈশাখে চাকরিজীবীরা ‘উৎসব ভাতা’ পেয়ে নতুন ও রঙিন পোশাক কেনেন নিজেদের এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য। নতুন ও রঙিন পোশাক পরে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করাটা এখন অনেক বেশি আনন্দের। মঙ্গল শোভাযাত্রা বাঙালির জীবনের আনন্দকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ প্রতিবারই নতুন নতুন চমক দেখান এবং সেই চমক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বাংলাদেশে। রঙিন পোশাকের পাশাপাশি পোশাকের ভিন্নতাও এসেছে। যেমনঃ কাতুয়া, ফতুয়া, শর্ট পাঞ্জাবী, লাল গামছা মাথায় জড়ানো, লাল লুঙ্গি ও হলুদের প্রাধান্য দেখা যায়। অপরদিকে মেয়েরাও রঙিন সালোয়ার-কামিজ বা শাড়ি পরে এবং পায়ে আলতা ও হাতে মেহেদী রং লাগিয়ে বৈশাখের গান গাইতে গাইতে উঠে বসেন গরুর গাড়িতে। আবার দল বেঁধে চলেন মেলায় বা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

বাংলাদেশে বৈশাখি মেলা নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে বহুবছর আগে থেকেই। এই মেলায় গেলে নাগরদোলা, সাপ খেলাসহ সার্কাস ও বাঙালির নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়, তেমনি মেলায় বিক্রির জন্য আনা হয় হাতপাখা, মাটির তৈজসপত্র, বেত-বাশেঁর ডালা, মাছ ধরার হোছা, কাঠের পিড়ি ও বেলুন, একতারা, দোতারা, বাঁশি, ঢোল, ঢাক, খরমসহ নানান রকমের বাঙালির ব্যবহারযোগ্য পণ্য। খাবারের মধ্যে রয়েছে ফল হিসেবে বাংগি, তরমুজ ও মিঠাইয়ের মধ্যে রয়েছে খোরমা, মিষ্টি, কান-মুচরি, খাজা-মিঠাই ও অন্যান্য মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি। আমাদের গাইবান্ধায় এতিহ্যবাহী মেলা হিসেবে কলেজ রোডের গোপালপুর পার হয়ে ঠাকুরবাড়ির মেলা, সাঘাটা উপজেলার ভরতখালীর মেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাসব্যাপী এই মেলা চলে সপ্তাহে ২/৩ দিন। সকল ধর্মের মানুষ মুখরিত করে রাখে এই মেলা। আর সে জন্যই বাঙালিরা বলেন যে, এ মেলা প্রাণের মেলা, এ মেলা মিলন মেলা।

রাজশ্রী রায়, ৩য় শ্রেণি, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

নববর্ষের উৎসবে বাঙালি পান্তা-ইলিশ খাবেই যার যার সাধ্য অনুযায়ী। অনেকেই ঘটা করে আয়োজন করেন মেহমানদের দাওয়াত দিয়ে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার জন্য। মাটির সানকিতে পান্তা-ইলিশ ও বিভিন্ন ভর্তা, পাটশাক খাওয়াটা বাঙালির সংস্কৃতিতে এক অন্যরকম আনন্দ। তাছাড়াও, পিঠা-পায়েশ, বুন্দা, লাড্ডু, খির কেউ কেউ তৈরি করে খাওয়ান।

অন্যান্য জেলার মতো আমাদের গাইবান্ধাতে সাংস্কৃতিক উৎসব হয় বেশ জাক-জমকভাবে। গাইবান্ধার উদীচী দিনব্যাপী আয়োজন করে নানান অনুষ্ঠানের। সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে দুপুরের পর থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কবিতা, গান, নৃত্য ও আলোচনা বৈশাখকে যেমন মুখরিত করে তোলে তেমনি পরবর্তী প্রজন্মও জানতে পারে বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিষয়ে। কবি সরোজ দেব প্রতিবার আয়োজন করেন পৌর পার্কের কড়ই তলায় আলোচনা ও বৈশাখী গানের। শুরু হয়- ‘এসো হে বৈশাখ, এসো এসো... গানটি দিয়ে। নারী-পুরষ সেজেগুজে মঞ্চে তৈরি করেন বৈশাখের আবহ ও আমেজ। গান হয় লালনগীতি, রবীন্দ্র সংগীত, হাছন রাজার গান, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালিসহ নানান লোকজ গান। মন মাতানো ছন্দের ও তালের নৃত্য গাইবান্ধায় খুব নামকরা। এই নৃত্য পরিবেশন করেন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। সাংবাদিক উত্তম সরকারের সংগঠন স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজন করেন শিশুদের নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কবি অমিতাভ দাশ হিমুনের পরিচালনায় ইচ্ছে ডানা নামক আবৃত্তি সংগঠন, কবি দেবাশীষ দাস দেবুর-অভিনন্দন আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র সংগঠন শিশুদের নিয়ে কবিতা পাঠের আসর বসান। নাটকের সংগঠনগুলিও আয়োজন করে বিভিন্ন নাটকের। মেঘদূত, গাইবান্ধা নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (গানাসাস), থিয়েটার, অন্তরঙ্গ থিয়েটার, পদক্ষেপ, সূরবাণীসহ বিভিন্ন সংগঠনগুলি। এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাক-জমকপূর্ণ শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সমস্ত বাঙালির জীবনে দিনে দিনে বয়ে আনে নতুন করে বাঙালিয়ানা। আমাদের বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আমরা চিরকালেই গর্ব করে যাবো। কবি শুকান্ত যথার্থই বলেছেন, ‘সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার, তবু মাথা নোয়াবার নয়।’ সত্যিই আমারা বাঙালি জাতি আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে আছি এবং থাকবো।

– সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

এই বৈশাখে

অঞ্জলী রানী দেবী

গ্রামে-গ্রামে বাজলো জোরে ঢাক
বছর শেষে খাজনা তোলার সম্রাট আকবর দিয়েছিলো ডাক
এসেছে পহেলা বৈশাখ।
জাতীয় উৎসব ঐতিহ্যবাহী শুভেচ্ছা শুভ নববর্ষ
গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে বাঙালির বাংলা বর্ষ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি
“মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য” বর্ষবরণরীতি
আমরা বাঙালি সর্বজনীন লোকজ উৎসবের মতো আমাদের সম্প্রীতি।
মঙ্গল ধ্বনির মতো সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রমনার বটমূলে ছায়ানটের সুর
মঙ্গল কামনায় একই সুরে গেয়ে ওঠে ‘এসো হে বৈশাখ, এসে এসো’গানের সুর।
ব্যবসায়ীদের হালখাতা আসছে চাপ
বাকি টাকা পরিশোধের বাড়ছে তাপ।
এই বৈশাখে দূর করে দাও পাপ পঙ্কিলতা কাল অন্ধকার
প্রার্থনার মতো পবিত্র নির্মল আলোময় হোক জীবন সবার ॥